আদ্ দাহ্‌র

৭৬

নামকরণ

সূরার একটি নাম আদ্ দাহ্‌র এবং আরেকটি নাম আল ইনসান। দু'টি নামই এর প্রথম আয়াতের هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ এবং حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ আয়াতাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তাফসীরকারদের অধিকাংশই বলেছেন যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। আল্লামা যামাখশারী (র), ইমাম রাযী, কাজী বায়যাবী, আল্লামা নিজামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেয ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক তাফসীরকার এটিকে মক্কী সূরা বলেই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলুসীর মতে এটিই অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে পুরা সূরাটিই মাদানী। আবার কারো কারো মতে এটি মক্কী সূরা হলেও এর ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মাদানী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এ বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এটি যে মক্কায় অবতীর্ণ শুধু তাই নয়, বরং মক্কী যুগেরও সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে পর্যায়টি আসে সে সময় নাযিল হয়েছিল। ৮ থেকে ১০ (ويطعمون الطعام থেকে يوما عبوسا قمطريرا) পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি কেউ পূর্বাপর মিলিয়ে তা পাঠ করে তাহলে তার মনেই হবে না যে, এর আগের এবং পরের বিষয়বস্তু ১৫–১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং এর কয়েক বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আসলে যে কারণে এ সূরা অথবা এর কয়েকটি আয়াতের মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আতা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বহু সংখ্যক সাহাবী (রা) তাদের দেখতে ও রোগ সংক্রান্ত খোঁজ–খবর নিতে যান। কোন কোন সাহাবী (রা) হযরত আলীকে (রা) পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন শিশু দু'টির রোগমুক্তির জন্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মানত করেন। অতএব হযরত আলী (রা), হযরত ফাতেমা (রা) এবং তাঁদের কাজের মেয়ে ফিদ্দা (রা) মানত করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি শিশু দু'টিকে রোগমুক্ত করেন তাহলে শুকরিয়া হিসেবে তাঁরা সবাই তিন দিন রোযা রাখবেন। আল্লাহর

মেহেরবানীতে উভয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা তিন জনে মানতের রোযা রাখতে শুরু করলেন। হযরত আলীর (রা) ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি তিন সা' পরিমাণ যব ধার–কর্জ করে আনলেন (একটি বর্ণনা অনুসারে মেহনত মজদুরী করে নিয়ে আসলেন)। প্রথম রোযার দিন ইফতারী করে যখন খাওয়ার জন্য বসেছেন সেসময় একজন মিসকীন এসে খাবার চাইলো। তারা সব খাবার সে মিসকীনকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত্রি কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও ইফতারীর পর যে সময় খেতে বসেছেন সে সময় একজন ইয়াতীম এসে কিছু চাইলো। সেদিনও তাঁরা সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন ইফতার করে খাবার জন্য সবেমাত্র বসেছেন সে সময় একজন বন্দী এসে একইভাবে খাদ্য চাইলো। সেদিনের সব খাবারও তাকে দিয়ে দেয়া হলো। চতুর্থ দিন হযরত আলী (রা) বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলে নবী (সা) দেখতে পেলেন, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় পিতা ও দুই ছেলে তিনজনের অবস্থাই অত্যন্ত সংগীন। তিনি সেখান থেকে উঠে তাঁদের সাথে ফাতেমার (রা) কাছে বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনিও ঘরের এককোণে ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় নিরব নিথর হয়ে পড়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে নবীর (সা) হৃদয়–মন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে আপনাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? জবাবে তিনি গোটা সূরাটা পাঠ করে শোনালেন। (ইবনে মিহরানের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত শোনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, ويطعمون الطعام আয়াতটি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাতে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই)। আলী ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী তার তাফসীর গ্রন্থ 'আল বাসীতে' এ ঘটনাটি পুরা বর্ণনা করেছেন। যামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী এবং অন্যান্য মুফাস্সিরগণ সম্ভবত সেখান থেকেই এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন।

এ রেওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া দেরায়াত বা বুদ্ধি–বিবেক ও বিচার–বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলেও এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত মনে হয় যে, একজন মিসকীন, একজন ইয়াতীম এবং একজন বন্দী এসে খাদ্য চাচ্ছে আর তাকে বাড়ীর পাঁচ পাঁচজন লোকের খাদ্য সবটাই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কি কোন যুক্তিসংগত ব্যাপার? একজনের খাদ্য তাকে দিয়ে বাড়ীর পাঁচ জন মানুষ চারজনের খাদ্য নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতে পারতেন। তাছাড়া একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, দু' দু'টি বাচ্চা যারা সবে মাত্র রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেছিল এবং দুর্বল ছিল তাঁদেরকেও তিন দিন যাবত অভুক্ত রাখা হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার (রা) মত দীন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদ্বয়ও নেকীর কাজ মনে করে থাকবেন! তাছাড়াও ইসলামী শাসন যুগে কয়েদীদের ব্যাপারে কখনো এ নীতি ছিল না যে, তাদেরকে ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তারা সরকারের হাতে বন্দী হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা সরকারই করতেন। আবার কোন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দান করা সে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হতো। তাই কোন বন্দী ভিক্ষা করতে বের

হবে মদীনায় এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তা সত্ত্বেও সমস্ত বর্ণনা ও যুক্তি–তর্কের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করে এ কাহিনীকে পুরোপুরি সত্য বলে ধরে নিলেও তা থেকে বড়জোর যা জানা যায় তা শুধু এতটুকু যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের লোকদের দ্বারা এ নেক কাজটি সম্পাদিত হওয়ার কারণে জিবরাঈল (আ) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুখবর শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে আপনার আহলে বায়তের এ কাজটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। কারণ তারা ঠিক সে পছন্দনীয় কাজটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা যার প্রশংসা সূরা দাহ্রের এ আয়াতগুলোতে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, আয়াত কয়টি এ উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল। শানে নুযুলের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়াতের অবস্থা হলো, কোন আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ আয়াতটি অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছিল তখন প্রকৃতপক্ষে তার এ অর্থ দাঁড়ায় না যে, যখন এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। বরং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আয়াতটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'ইতকান' গ্রন্থে হাফেয ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, "রাবী যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটিই তার নাযিল হওয়ার কারণ। আবার কোন কোন সময় তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটি এ আয়াতের নির্দেশের অন্তরভুক্ত, যদিও তা তার নাযিল হওয়ার কারণ নয়।" এরপর তিনি ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশীর গ্রন্থ 'আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বক্তব্যটি হলো, "সাহাবা ও তাবেয়ীদের ব্যাপারে এ নীতি সাধারণ ও সর্বজনবিদিত যে, তাঁদের কেউ যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের নির্দেশ ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য। তার এ অর্থ কখনো হয় না যে, উক্ত ঘটনাই এ আয়াতটির নাযিলের কারণ। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে আয়াতটি থেকে দলীল পেশ করা হয় মাত্র। তা দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না।" (আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১, মুদ্রণ ১৯২৯ ইং)

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। তাকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সে যদি তার এ মর্যাদা ও অবস্থানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে শোকর বা কৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে তাহলে তার পরিণতি কি হবে এবং তা না করে যদি কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাহলেই বা কি ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হবে। কুরআনের বড় বড় সূরাগুলোতে এ বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মক্কী যুগের প্রথম পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি হলো পরবর্তী সময়ে যেসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এ যুগে সে বিষয়গুলোই অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মন–মগজে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এ জন্য সুন্দর ও ছোট ছোট এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আপনা আপনি শ্রোতার মুখস্ত হয়ে যায়।

এতে সর্বপ্রথম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক সময় এমন ছিল, যখন সে কিছুই ছিল না। তারপর সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা এত সূক্ষ্মভাবে তার সৃষ্টির সূচনা করা

হয়েছে যে, তার মা পর্যন্তও বুঝতে পারেনি যে, তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। অন্য কেউও তার এ অণুবীক্ষণিক সত্তা দেখে একথা বলতে সক্ষম ছিল না যে, এটাও আবার কোন মানুষ, যে পরবর্তী সময়ে এ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে গণ্য হবে। এরপর মানুষকে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, এভাবে তোমাকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে তোমাকে পৌছানোর কারণ হলো তোমাকে দুনিয়াতে রেখে আমি পরীক্ষা করতে চাই। তাই অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সামনে শোকর ও কুফরের দু'টি পথ স্পষ্ট করে রেখে দেয়া হয়েছে। এখানে কাজ করার জন্য তোমাকে কিছু সময়ও দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখতে চাই এ সময়ের মধ্যে কাজ করে অর্থাৎ এভাবে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি নিজেকে শোকরগোজার বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো না কাফের বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো।

অতপর যারা এ পরীক্ষায় কাফের বলে প্রমাণিত হবে আখেরাতে তাদের কি ধরনের পরিণতির সন্মুখীন হতে হবে তা শুধু একটি আয়াতের মাধ্যমেই পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর আয়াত নং ৫ থেকে ২২ পর্যন্ত একাদিক্রমে সেসব পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা দিয়ে সেসব লোকদের তাদের রবের কাছে অভিষিক্ত করা হবে, যারা এখানে যথাযথভাবে বন্দেগী করেছে। এ আয়াতগুলোতে শুধুমাত্র তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়ার কথা বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং সংক্ষেপে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কি কি কাজের জন্য তারা এ প্রতিদান লাভ করবে। মক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা–বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান নৈতিক গুণাবলী এবং নেক কাজের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব কাজ–কর্ম ও এমন সব মন্দ নৈতিক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায়। আর দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে ভাল অথবা মন্দ কি ধরনের ফলাফল প্রকাশ পায় সেদিক বিবেচনা করে এ দু'টি জিনিস বর্ণনা করা হয়নি। বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবেন তার স্থায়ী ফলাফল কি দাঁড়াবে কেবল সে দিকটি বিবেচনা করেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ার এ জীবনে কোন খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কল্যাণকর প্রমাণিত হোক বা কোন ভাল চারিত্রিক গুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হোক তা এখানে বিবেচ্য নয়।

এ পর্যন্ত প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হলো। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, এ কুরআনকে অল্প অল্প করে তোমার ওপরে আমিই নাযিল করছি। এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবধান করে দেয়া নয়, বরং কাফেরদের সাবধান করে দেয়া। কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনগড়া বা স্বরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তার নাযিলকর্তা আমি নিজে। আমার জ্ঞান ও কর্মকৌশলের দাবী হলো, আমি যেন তা একবারে নাযিল না করি বরং অল্প অল্প করে বারে বারে নাযিল করি। দ্বিতীয় যে কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে তাহলো, তোমার রবের ফায়সালা আসতে যত

দেরীই হোক না কেন এবং এ সময়ের মধ্যে তোমার ওপর দিয়ে যত কঠিন ঝড়-ঝঞ্চাই বয়ে যাক না কেন তুমি সর্বাবস্থায় ধৈর্যের সাথে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। কখনো এসব দুষ্কর্মশীল ও সত্য অস্বীকারকারী লোকদের কারো চাপে পড়ে নতি স্বীকার করবে না। তৃতীয় যে কথাটি তাঁকে বলা হয়েছ তা হলো, রাত দিন সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করো, নামায পড় এবং আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দাও। কারণ কুফরের বিধ্বংসী প্লাবনের মুখে এ জিনিসটিই আল্লাহর পথে আহবানকারীদের পা-কে দৃঢ় ও মজবুত করে।

এরপর আরেকটি ছোট বাক্যে কাফেরদের ভ্রান্ত আচরণের মূল কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় আরেকটি বাক্যে তাদের এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজে নিজেই জন্ম লাভ করোনি । আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, বুকের এ চওড়া ছাতি এবং মজবুত ও সবল হাত-পা তুমি নিজেই নিজের জন্য বানিয়ে নাও নি। ওগুলোও আমিই তৈরী করেছি। আমি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। সবসময়ের জন্য সে ক্ষমতা আমার করায়ত্ব। আমি তোমাদের চেহারা ও আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারি। তোমাদের ধ্বংস করে অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদের মেরে ফেলার পর যে চেহারা ও আকৃতিতে ইচ্ছা পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি।

সবশেষে এ বলে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে যে, এ কুরআন একটি উপদেশপূর্ণ বাণী। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করতে পারে। তবে দুনিয়াতে মানুষের ইচ্ছা সব কিছু নয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কারো ইচ্ছাই পূরণ হতে পারে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যা-ই ইচ্ছা করুন না কেন তা হয় নিজের জ্ঞান ও কর্মকৌশলের আলোকে। এ জ্ঞান ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে তিনি যাকে তাঁর রহমতলাভের উপযুক্ত মনে করেন তাকে নিজের রহমতের অন্তরভুক্ত করে নেন। আর তাঁর কাছে যে জালেম বলে প্রমাণিত হয় তার জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

মানুষের ওপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না[১]? আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি[২] যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি।[৩] এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।[৪]

১. আয়াতের প্রথমাংশ হলো هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ । এখানে অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও অনুবাদক هَلْ শব্দটিকে قَدْ শব্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এর অর্থ করেছেন নিঃসন্দেহে মানুষের ওপরে এরূপ একটি সময় এসেছিল। তবে هل আরবী ভাষায় মূলত ঃ 'কি'র অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সর্বাবস্থায় এর দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝায় না। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে প্রশ্নবোধক এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বলা হয়ে থাকে। যেমন, কখনো আমরা জানতে চাই যে, অমুক ঘটনা ঘটেছিল না ঘটেনি আর সে জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি, এ ধরনের ঘটনা কি ঘটেছিল? কোন কোন সময় আবার প্রশ্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় না, বরং উদ্দেশ্য হয় কোন বিষয় অস্বীকার করা। তখন যে বাচনভংগি ব্যবহার করে আমরা তা অস্বীকার করি তাহলো অন্য কেউও কি এ কাজ করতে পারে? কোন সময় আমরা কারো থেকে কোন বিষয়ে স্বীকৃতি পেতে চাই এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি তোমার টাকা পরিশোধ করেছি? কোন সময় আবার শুধু স্বীকৃতি আদায় করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয় না। বরং তখন আমরা প্রশ্ন করি শ্রোতার মন মগজকে আরো একটি বিষয় ভাবতে বাধ্য করার জন্য যা তার স্বীকৃতির অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা দেয়। যেমন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি ঃ আমি কি তোমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেছি? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, সে স্বীকার করুক, আপনি তার সাথে সত্যিই কোন খারাপ আচরণ করেননি। বরং এর উদ্দেশ্য তাকে একথাও চিন্তা করতে বাধ্য করা যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি তার সাথে আমার খারাপ আচরণ করা কতটুকু ন্যায় সংগত? আলোচ্য আয়াতের

প্রশ্নবোধক অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে এ শেষ অর্থেই বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষকে শুধু এতটুকু স্বীকার করানো নয় যে, তার ওপরে এমন একটি সময় সত্যিই অতিবাহিত হয়েছে। বরং এর দ্বারা তাকে এ বিষয়ও চিন্তা করতে বাধ্য করা উদ্দেশ্য যে, যে আল্লাহ এমন নগণ্য অবস্থা থেকে সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেন?

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হলো حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ । دهر অর্থ– অন্তহীন মহাকাল যার আদি–অন্ত কিছুই মানুষের জানা নেই। আর حِيْنٌ অর্থ অন্তহীন এ মহাকালের বিশেষ একটি সময়, মহাকাল প্রবাহের কোন এক পর্যায়ে যার আগমন ঘটেছিল। বক্তব্যের সারমর্ম হলো, এ অন্তহীন মহাকালের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন মানব প্রজাতির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর এ মহাকাল প্রবাহে এমন একটি সময় আসলো যখন মানুষ নামের একটি প্রজাতির সূচনা করা হলো। এ সময়–কালে প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন একটি সময় এসেছে যখন তাকে শূন্য মাত্রা বা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বদানের সূচনা করা হয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় অংশ হলো لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا অর্থাৎ তখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। তার একটি অংশ বাপের শুক্রের মধ্যে অণুবীক্ষণিক জীবাণু আকারে এবং আরেকটি অংশ মায়ের বীর্যে একটি অণুবীক্ষণিক ডিম্বের আকারে বর্তমান ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ও জানতো না যে, একটি শুক্রকীট এবং একটি ডিম্বকোষের মিলনের ফলেই সে অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে এ দু'টিকে দেখতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কেউ বলতে পারে না যে, পিতার এ শুক্রকীটে এবং মায়ের ডিম্বকোষে কত সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব থাকে। গর্ভসঞ্চারকালে এ দু'টি জিনিসের মিলনে যে প্রাথমিক কোষ (Cell) সৃষ্ট হয় তা পরিমাণহীন এমন একটি পরমাণু যা কেবল অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যেতে পারে। আর তা দেখার পরেও আপাত দৃষ্টিতে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এভাবে কোন মানুষ জন্মলাভ করছে কিংবা এ নগণ্য সূচনা বিন্দু থেকে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে কোন মানুষ যদি সৃষ্টি হয়ও তাহলে সে কেমন দৈহিক উচ্চতা ও কাঠামো, কেমন আকার–আকৃতি এবং কেমন যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বধারী মানুষ হবে তাও বলতে পারে না। সে সময় সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না, এ বাণীর তাৎপর্য এটাই। যদিও মানুষ হিসেবে সে সময় তার অস্তিত্বের সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

২. এক সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা অর্থ হলো, মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। মানুষ নিছক গাছপালা বা জীব–জন্তুর মত নয় যে, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার নিজের অংশের করণীয় কাজ সম্পাদন করার পর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া এ দুনিয়া তার জন্য আযাব বা শাস্তির স্থান নয় যেমনটা খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করে, প্রতিদানের ক্ষেত্রও নয় যেমনটা জন্মান্তরবাদীরা মনে করে, চারণ ক্ষেত্র বা

বিনোদন কেন্দ্র নয় যেমনটা বস্তুবাদীরা মনে করে আবার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্ষেত্রও নয় যেমনটা ডারউইন ও মার্কসের অনুসারীরা মনে করে থাকে। বরং দুনিয়া মূলত তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। যে জিনিসকে সে বয়স বা আয়ুষ্কাল বলে মনে করে আসলে তা পরীক্ষার সময় যা তাকে এ দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, যেসব বস্তুকে কাজে লাগানোর সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা নিয়ে বা অবস্থানে থেকে সে এখানে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবই মূলত অসংখ্য পরীক্ষা পত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে না। বরং আখেরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা পত্র পরীক্ষা ও যাঁচাই বাছাই করে ফায়সালা দেয়া হবে। সে সফল না বিফল। তার সফলতা ও বিফলতার সবটাই নির্ভর করবে এ বিষয়ের ওপর যে, সে তার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে এখানে কাজ করেছে এবং তাকে দেয়া পরীক্ষার পত্রসমূহে সে কিভাবে জবাব লিখেছে। নিজের সম্পর্কে সে যদি মনে করে থাকে যে, তার কোন আল্লাহ নেই অথবা নিজেকে সে বহু সংখ্যক ইলাহর বান্দা মনে করে থাকে এবং পরীক্ষার সবগুলো পত্রে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জবাব লিখে থাকে যে, আখেরাতে তাকে তার স্রষ্টার সামনে কোন জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা মনে করে আল্লাহর মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসারে কাজ করে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহির চেতনা বিবেচনায় রেখে তা করে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলা। (এ বিষয়টি কুরআন মজীদে এত অধিক জায়গায় ও এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে স্থানগুলোর নাম উল্লেখ করা বেশ কঠিন। যারা এ বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে চান তারা তাফহীমুল কুরআনের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযুক্ত বিষয়সূচীর মধ্যে 'পরীক্ষা' শব্দটি বের করে সেসব স্থান দেখুন যেখানে কুরআন মজীদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কোন গ্রন্থ নেই যার মধ্যে এ সত্যটি এত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. আসলে বলা হয়েছে আমি তাকে سميع ও بصير বানিয়েছি। বিবেকবুদ্ধির অধিকারী করেছি বললে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু অনুবাদে আমি سميع শব্দের অর্থ "শ্রবণশক্তির অধিকারী" এবং بصير শব্দের অর্থ 'দৃষ্টিশক্তির অধিকারী' করেছি। যদিও এটিই আরবী ভাষার এ দু'টি শব্দের শাব্দিক অনুবাদ কিন্তু আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, জন্তু-জানোয়ারের জন্য কখনো سميع ও بصير শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ জন্তু-জানোয়ারও দেখতে এবং শুনতে পায়। অতএব এখানে শোনা এবং দেখার অর্থ শোনার ও দেখার সে শক্তি নয় যা জন্তু-জানোয়ারকেও দেয়া হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, শোনা ও দেখার সেসব উপায়-উপকরণ যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাছাড়া শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যেহেতু মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই সংক্ষেপে এগুলোরই উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যেসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে থাকে আসলে এসব ইন্দ্রিয়ের সবগুলোকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তা ধরন ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পশুদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটি চিন্তাশীল মন-মগজ

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ۝

আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।[৫] আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

বর্তমান যা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে, মতামত স্থির করে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার ওপরে তার কার্যকলাপ ও আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে আমি তাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম একথাটি বলার পর আমি এ উদ্দেশ্যেই তাকে سميع ও بصير অর্থাৎ 'শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি' কথাটি বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপর্যুক্ত হতে পারে। বাক্যটির অর্থ যদি এটা না হয় এবং سميع ও بصير বানানোর অর্থ যদি শুধু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানানো হয় তাহলে অন্ধ ও বধির ব্যক্তিরা এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায় অথচ জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধি থেকে যদি কেউ পুরোপুরি বঞ্চিত না হয় তাহলে তার এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৫. অর্থাৎ আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই সূরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ "আমি তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।" সূরা শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا "শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া–পরহেজগারীর অনুভূতি দু'টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" এসব ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ সামনে রেখে বিচার করলে এবং পৃথিবীতে মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব ব্যবস্থার কথা কুরআন মজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাও সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানোর যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথপ্রদর্শনের কোন একটি মাত্র পন্থা ও উপায় বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা অনেক পন্থা ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমন ঃ

এক ঃ প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ–কর্ম ও বৈশিষ্টকে খারাপ বলে জানে যদিও সে

নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ–কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। এমন কি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ–লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছে যার ভিত্তিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন্দ কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তাদের ওপর আরোপ করে, তাহলে তারা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে তারা নিজেরাও সেসব কাজকে খারাপই মনে করে থাকে। অনুরূপ ভাল কাজ ও গুণাবলীকে কেউ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং সেকেলে ঠাওরিয়ে রাখলেও কোন মানুষের কাছ থেকে তারা যখন নিজেরাই নিজেদের সদাচরণের সুফল বা উপকার লাভ করে তখন তারা সেটিকে মূল্যবান মনে করতে বাধ্য হয়ে যায়।

দুই ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর–সোহাগ দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই সে করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দুনিয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর অজুহাত খাড়া করে দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে অসংখ্য ওজর পেশ করতে পারে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বভাব–প্রকৃতিতে যে হিসেব পরীক্ষককে নিয়োজিত রেখেছেন সে এত জীবন্ত ও সজাগ যে, সে নিজে প্রকৃতপক্ষে কি তা কোন অসৎ মানুষের কাছেও গোপন থাকে না। সূরা আল কিয়ামাহতে একথাটিই বলা হয়েছে যে, "মানুষ যত ওজরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।" (আয়াত ১৫)

তিন ঃ মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চারাপাশে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এতসব জিনিস কোন আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক খোদা এ বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নিদর্শনাবলীই কিয়ামত ও আখেরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছে। মানুষ যদি এসব থেকে চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি–বিবেক কাজে লাগিয়ে এসব বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্যের সন্ধান দাতা নিদর্শনাদি পেশ করতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেনি।

চার ঃ মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন–কর্তৃত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন যাঁর সামনে সে নিতান্তই অসহায়। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

(বেহেশতে) নেক্‌কার লোকেরা[৬] পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে। এটি হবে একটি বহমান ঝর্ণা[৭] আল্লাহর বান্দারা[৮] যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা–প্রশাখা বের করে নেবে।[৯] এরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়াতে) মানত পূরণ করে[১০] সে দিনকে ভয় করে যার বিপদ সবখানে ছড়িয়ে থাকবে।

বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহেই শুধু এ সত্যের প্রমাণ পেশ করে না। বরং মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যেও সে সর্বোচ্চ শাসন–কর্তৃত্বের প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাস্তিকরাও আল্লাহর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে এবং কট্টর মুশরিকরাও সব মিথ্যা খোদাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

পাঁচ ঃ মানুষের বিবেক–বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন রূপে বিচার–ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং যেসব কাজ–কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ারও কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যা অস্বীকার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা যদি স্বীকার করা হয় যে, এ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ আছে যার যথাযোগ্য শাস্তি তো দূরের কথা আদৌ কোন শাস্তি দেয়া যায় না এবং এমন অসংখ্য সেবামূলক ও কল্যাণকর কাজ আছে যার যথাযোগ্য প্রতিদান তো দূরের কথা কাজ সম্পাদনকারী আদৌ কোন প্রতিদান লাভ করতে পারে না তাহলে আখেরাতকে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তবে কোন নির্বোধ যদি মনে করে অথবা কোন হঠকারী ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা পোষণকারী মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্মলাভ করে ফেলেছে যেখানে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত তবে সেটা আলাদা কথা, এরপর অবশ্য একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাহলো, এমন এক বিশ্বে জন্মলাভকারী মানুষের মধ্যে ইনসাফের এ ধারণা এলো কোথা থেকে?

ছয় ঃ এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, শোকরের পথ কোন্‌টি ও কুফরের পথ কোন্‌টি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি? নবী-রসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় এত ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন জনপদই আল্লাহ ও আখেরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, নবী-রসূলদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তারা এ জ্ঞান লাভ করেছে তা তাদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব লোক নবী-রসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে অথবা তাঁদের সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে থাকে যা মূলত ঐ সব শিক্ষা থেকে উৎসারিত ও উৎপন্ন হয়ে তাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ মূল উৎস কি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

৬. মূল আয়াতে ابرار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাদের রবের আনুগত্য করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে।

৭. অর্থাৎ তা কর্পূর মিশ্রিত পানি হবে না বরং তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তার খোশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মত।

৮. عباد الله (আল্লাহর বান্দারা) কিংবা عباد الرحمن (রাহমানের বান্দারা) শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসৎলোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের মহান নামের সাথে যুক্ত করে عباد الله অথবা عباد الرحمن এর মত সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন।

৯. এর দ্বারা বুঝায় না যে, তারা সেখানে কোদাল ও খন্তা নিয়ে নালা খনন করবে এবং এভাবে উক্ত ঝর্ণার পানি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো, জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে। সহজেই বের করে নেবে কথাটি এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করে।

১০. 'নযর' বা মানত পূরণ করার একটা অর্থ হলো, মানুষের ওপর যা কিছু ওয়াজিব করা হয়েছে তা তারা পূরণ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মানুষ তার নিজের ওপর যা ওয়াজিব করে নিয়েছে কিংবা অন্য কথায় সে যে কাজ করার সংকল্প বা ওয়াদা করেছে তা পূরণ করবে। তৃতীয় অর্থ হলো, ব্যক্তির ওপরে যা ওয়াজিব তা সে পূরণ করবে। তা তার ওপর ওয়াজিব করা হয়ে থাকুক অথবা সে নিজেই তার ওপর ওয়াজিব করে নিয়ে থাকুক। এ তিনটি অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি বেশী পরিচিত এবং 'নযর' শব্দ দ্বারা

সাধারণত এ অর্থটিই বুঝানো হয়ে থাকে। যাই হোক, এখানে ঐ সমস্ত লোকের প্রশংসা হয়তো এ জন্য করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ওয়াজিবসমূহ পালন করে। অথবা এ জন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সৎ মানুষ। যেসব ওয়াজিব বা করণীয় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেগুলো পালনের ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি করা তো দূরের কথা যেসব ভাল ও কল্যাণকর কাজ আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াজিব বা করণীয় করে দেননি তারা যখন আল্লাহর কাছে সে কাজ করার ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদাও পালন করে।

মানতের বিধি–বিধান ও হুকুম–আহকাম তাফহীমুল কুরআনে সূরা বাকারার ৩১০ নং টীকায় আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। তবে এখানে তা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যথার্থ বলে মনে করছি। যাতে এ ব্যাপারে মানুষ যেসব ভুল করে অথবা যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে দেখা যায় তা থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং এর সঠিক নিয়ম–কানুন অবহিত হতে পারে।

এক ঃ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'নযর' বা মানত চার প্রকারের। এক, এক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলো যে, সে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অমুক নেক কাজ সম্পাদন করবে। দুই, সে মানত করলো যে, আল্লাহ যদি আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করেন তাহলে আমি শোকরিয়া হিসেবে অমুক নেক কাজ করবো। এ দুই প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'নযরে তাবাররুর' বা নেক কাজের মানত বলা হয় এবং এ ব্যাপারে তারা একমত যে, এ নযর পূরণ করা ওয়াজিব। তিন, কোন ব্যক্তির কোন নাজায়েজ কাজ করার কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ না করার সংকল্প করা। চার, কোন ব্যক্তির কোন মুবাহ কাজ করা নিজের জন্য ওয়াজিব করে নেয়া অথবা কোন অবাঞ্ছিত কাজ করার সংকল্প করা। এ দু' প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় "নযরে লাজাজ" (মূর্খতা, ঝগড়াটেপনা ও হঠকারিতামূলক মানত) বলে। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকারের মানত সম্পর্কে সব ফিকাহবিদের ঐকমত্য হলো, তা মানত হিসেবে পরিগণিত হয় না। চতুর্থ প্রকারের মানত সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন ঃ এ মানত পূরণ করা কর্তব্য। কেউ কেউ বলেন ঃ শপথ ভংগের কাফ্ফারা দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মানত পূরণ করতে পারে কিংবা কাফ্ফারা দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে এ প্রকারের মানতও আদৌ মানত হিসেবে গণ্য হয় না। আর হানাফীদের মতে এ দু' প্রকারের মানতের জন্য কাফ্ফারা দেয়া আবশ্যিক হয়ে যায়। (উমদাতুল কারী)

দুই ঃ কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেউ যদি মনে করে মানত দ্বারা 'তাকদীর' পরিবর্তিত হয়ে যাবে অথবা যে মানতে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শোকরিয়া হিসেবে নেক কাজ করার পরিবর্তে আল্লাহকে বিনিময় হিসেবে কিছু দেয়ার জন্য এভাবে চিন্তা করে যে, তিনি যদি আমার কাজটি করে দেন তাহলে আমি তাঁর জন্য অমুক নেক কাজটি করে দেব। তবে এ ধরনের মান্নত নিষিদ্ধ। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّذْرِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ -

"একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত মানতে নিষেধ করতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন, মানত কোন কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির দ্বারা তার কিছু অর্থ ব্যয় করানো হয়। (মুসলিম–আবু দাউদ)

হাদীসের শেষ অংশের অর্থ হলো, কৃপণ ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার মত বান্দা নয়। মানতের মাধ্যমে সে এ লোভে কিছু খরচ করে যে, এ বিনিময় গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তার তাকদীর পরিবর্তন করে দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلنَّذْرُ لاَيُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ -

"মানত কোন কাজকে এগিয়ে আনতে কিংবা আশু সংঘটিতব্য কোন কাজকে পিছিয়ে দিতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির কিছু অর্থ–সম্পদ খরচ করানো হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّهُ لاَ يَاْتِى بِخَيْرٍ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ

"এভাবে কোন উপকার বা কল্যাণ হয় না। তবে বখীল কর্তৃক তার অর্থ–সম্পদ থেকে কিছু খরচ করানো হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (রা) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে প্রায় এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম উভয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তারা বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلٰكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدْرَ فَيُخْرِجُ بِذٰالِكَ مِنَ الْبَخِيْلِ مَالَمْ يَكُنِ الْبَخِيْلُ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَ -

"আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের তাকদীরে যা নির্ধারিত করেননি, মানত ঐ মানুষকে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না। তবে মানত তাকদীর অনুসারেই হয়ে থাকে। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর এভাবে বখীলের কাছ থেকে সেই বস্তু বের করে নেয় যা সে অন্য কোন কারণে বের করতো না।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِىَ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ

"যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় প্রকৃত মানত সেটিই।" (তাহাবী)।

তিন ঃ মানতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একটি নিয়ম বা ফর্মূলা বলেছেন। তাহলো, যেসব মানত আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হবে কেবল সে সব মানত পূরণ করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন মানত কখনো পূরণ করা যাবে না। অনুরূপ কোন ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক নয় সে বস্তু দিয়ে কোন মানত করা যায় না। অথবা মানুষের সাধ্যাতীত কোন কাজ দিয়েও মানত করা যায় না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِ اللّٰهِ فَلاَ يَعْصِهٖ

"কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাহলে যেন সে তাঁর আনুগত্য করে। আর কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর নাফরমানী করবে তাহলে যেন সে তা না করে।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাহাবী)।

সাবেত ইবনে দ্বাহ্হাক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَّةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ

"আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন বিষয়ে কিংবা যে বস্তু ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে মানত পূরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। (আবু দাউদ)

মুসলিম এ একই বিষয় সম্বলিত হাদীস হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আসের (রা) বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ হাদীসে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ

لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِىْ مَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ ، وَلاَ فِىْ مَعْصِيَّةِ اللّٰهِ وَلاَ فِىْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ -

"মানুষের আয়ত্বাধীন বা নাগালের মধ্যে নয় এমন কোন কাজে কোন মানত বা শপথ অচল। অনুরূপ আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত কোন কাজেও মানত বা শপথ কার্যকর হবে না।"

চার ঃ যে কাজে মূলত কোন নেকী নেই এবং ব্যক্তি অযথা কোন অর্থহীন কাজ কিংবা অসহনীয় কঠোর পরিশ্রম অথবা আত্মপীড়নকে নেক কাজ মনে করে তা নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিয়েছে তার এরূপ মানত পূরণ না করা উচিত। এ ব্যাপারে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ একবার নবী (সা) খুতবা পেশ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে এবং কেনই বা সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে? তাঁকে বলা হলো, লোকটির নাম আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

مُرُوْهُ فَلْيَكَلِّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"তাকে বলো, সে কথা বলুক, ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করুক এবং বসুক। তবে রোযা যেন পালন করে।" (বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা)

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বলেন আমার বোন খালি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করলো। সে আরো মানত করলো যে, হজ্জের এ সফরে সে মাথায়ও কাপড় দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং মাথায় কাপড় দেয়। (আবু দাউদ ও মুসলিম এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তাতে কিছু শাব্দিক তারতম্য আছে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উকবা ইবনে আমেরের বোনের এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তার ভাষা হলো,

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ

"তার এ মানতের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায়।" (আবু দাউদ)

আরো একটি হাদীস বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً

"তোমার বোনের কঠোর পরিশ্রমে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তার উচিত সওয়ারীর পিঠে উঠে হজ্জ করা।" (আবু দাউদ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সম্ভবত হজ্জের সফরে) দেখলেন এক বয়োবৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তিকে তার দুই পুত্র ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? বলা হলো, সে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ

"এ ব্যক্তি নিজে নিজেকে কষ্ট দেবে, তাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি তাকে বাহনে সওয়ার হতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা থেকেও এ একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে)

পাঁচ ঃ কোন মানত পূরণ করা যদি কার্যত অসম্ভব হয় তাহলে তা অন্য কোন ভাবে পূরণ করা যেতে পারে। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি এ মর্মে মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ যদি আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন তাহলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে দুই রাকআত নামায পড়বো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখানেই পড়ে নাও। সে আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনিও পুনরায় একই জবাব দিলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ شَأنَكَ اِذًا তাহলে এখন তোমার মর্জি। অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، لَوْ صَلَّيْتَ هٰهُنَا لَاَجْزَا عَنْكَ صَلٰوةً فِىْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ –

"সে মহান সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে ন্যায় ও সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন; তুমি যদি এখানে নামায পড়ে নাও, তাহলে তা বায়তুল মাকদাসে নামায পড়ার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে।" (আবু দাউদ)

ছয় ঃ কেউ যদি তার সমস্ত অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য মানত করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে তাকে এক–তৃতীয়াংশ সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। মালেকীদের মধ্য থেকে 'সাহনূনের' বক্তব্য তাকে এতটা সম্পদ দিয়ে দিতে হবে যতটা দিলে সে কষ্টের মধ্যে পড়বে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ এটা যদি তার 'নযরে তাবাররুর' (নেকীর উদ্দেশ্যে মানত) হয় তাহলে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। আর যদি 'নযরে লাজাজ' (মূর্খতা ও হঠকারিতামূলক মানত) হয় তাহলে সে উক্ত মানত পূরণ করতে পারে কিংবা 'কসম' বা শপথের 'কাফ্‌ফারা'ও দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা বলেন ঃ তাকে যেসব অর্থ–সম্পদের যাকাত দিতে হয় সেসব সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। কিন্তু যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয় না, যেমন, বসত বাড়ী এবং অনুরূপ অন্যান্য সম্পদ তার ওপর এ মানত প্রযোজ্য হবে না। হানাফীদের মধ্যে ইমাম যুফারের (র) বক্তব্য হলো, নিজের পরিবার–পরিজনের জন্য দুই মাসের প্রয়োজনীয় খরচ রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ সাদকা করে দিতে হবে। (উমদাতুল কারী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ কৃত মুয়াত্তার শরাহ) এ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাহলো, হযরত কা'ব ইবনে মালেক বলেন, তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যে তিরস্কার ও অসন্তোষের শিকার আমি হয়েছিলাম তা মাফ হয়ে গেলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলাম যে, আমার তাওবার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তরভুক্ত ছিল যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পথে দান করে দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না, এরূপ করো না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ? তিনি বললেন ঃ না, তাও না। আমি আবার বললাম, তাহলে এক–তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ হাঁ। (আবু দাউদ) অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

তুমি তোমার কিছু সম্পদ যদি নিজের জন্য রেখে দাও তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোত্তম হবে। (বুখারী) ইমাম যুহরী বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আবু লুবাবা (রা) (তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে তিনিও তিরস্কার ও অসন্তোষের শিকার হয়েছিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে সাদকা হিসেবে দিয়ে দিতে চাই। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। (মুয়াত্তা)

সাত ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেউ যদি কোন নেক মানত করে তাহলে ইসলাম গ্রহণের পরে কি তা পূরণ করতে হবে? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফতোয়া হলো, তা পূরণ করতে হবে। বুখারী, আবু দাউদ ও তাহাবীতে হযরত 'উমর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি জাহেলী যুগে মানত করেছিলেন যে, মসজিদে হারামে এক রাত (কারো কারো বর্ণনায় একদিন) ই'তিকাফ করবেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ اوف بنذرك 'নিজের মানত পূরণ করো।' কোন কোন ফিকাহবিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশের অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা মুস্তাহাব।

আট ঃ মৃত ব্যক্তির কোন মানত থাকলে তা পূরণ করা কি ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব? এ প্রশ্নে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহামদ, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়া, আবু সাওর এবং জাহেরিয়াদের মতে মৃতের দায়িত্বে যদি রোযা বা নামাযের মানত থেকে থাকে তাহলে ওয়ারিশদের জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে মৃত ব্যক্তি যদি শারীরিক ইবাদাতের (নামায বা রোযা) মানত করে থাকে তাহলে তা পূরণ করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি আর্থিক ইবাদাতের মানত করে থাকে এবং মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার ওয়ারিশদের তা পূরণ করার অছিয়ত না করে থাকে তাহলে সে মানতও পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে যদি অছিয়ত করে যায়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ দিয়ে নয়। এর সাথে মালেকী মাযহাবের মতামতের অনেকটা মিল আছে। শাফেয়ী মাযহাবের মতে, মানত যদি আর্থিক ইবাদাতের না হয়ে অন্য কিছুর হয় কিংবা আর্থিক ইবাদাতেরই হয় আর মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না গিয়ে থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সে অছিয়ত করে থাকুক বা না থাকুক এ ক্ষেত্রে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব। (শরহে মুসলিম লিন নববী, বাযলুল মাজহুদ-শরহে আবী দাউদ) এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি একটি মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার সে মানত পূরণ করে দাও। (আবু দাউদ, মুসলিম) ইবনে আব্বাস অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা সমুদ্র যাত্রা করার সময় মানত করলো, আমি যদি সহী সালামতে জীবিত

ঘরে ফিরে আসতে পারি তাহলে একমাস রোযা রাখবো। ফিরে আসার পরেই সে মারা গেল। তার বোন ও মেয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে তুমি রোযা রাখো। (আবু দাউদ) আবু দাউদ বুরাইদা থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে সে একই জবাব দিলেন যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে নির্দেশ রয়েছে তা ওয়াজিব অর্থে না মুস্তাহাব অর্থে তা যেহেতু পরিষ্কার নয় এবং হযরত সা'দ ইবনে উবাদার মায়ের মানত আর্থিক ইবাদাতের মানত ছিল না শারীরিক ইবাদাতের মানত ছিল তাও স্পষ্ট নয় তাই এ মাসয়ালার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নয় ঃ ভ্রান্ত ও নাজায়েজ প্রকৃতির মানত সম্পর্কে একথা পরিষ্কার যে, তা পূরণ করা ঠিক নয়। তবে এ ধরনের মানতের ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে হাদীসসমূহের বর্ণনাই যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই ফিকাহবিদগণও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এক শ্রেণীর বর্ণনায় আছে যে, এ অবস্থায় নবী (সা) কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ "গোনাহের কাজে কোন মানত করা যায় না। এ ধরনের মানতের কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার মত।" (আবু দাউদ) 'উকবা ইবনে আমের জুহানীর বোনের ব্যাপারে (ওপরে ৪নং এ যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "সে যেন তার মানত ভঙ্গ করে এবং তিন দিন রোযা রাখে।" (মুসলিম, আবু দাউদ) আরেকজন মহিলা যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল তার ব্যাপারে নবী (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে।" (আবু দাউদ) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنَ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَّةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ -

"কেউ যদি মানত করে এবং কি মানত করলো তা নির্দিষ্ট না করে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। কেউ যদি কোন গোনাহর কাজের মানত করে, তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। কেউ যদি এমন বিষয়ের মানত করে যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। আর কেউ যদি এমন জিনিসের মানত করে যা পূরণ করার সামর্থ তার আছে, তাহলে তাকে সে মানত পূরণ করতে হবে।" (আবু দাউদ)

অন্য দিকে আছে সেসব হাদীস যা থেকে জানা যায় যে, এসব অবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে না। ওপরে ৪নং এ যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

আর আল্লাহর মহব্বতে[১১] মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীকে[১২] খাবার দান করে[১৩] এবং (তাদেরকে বলে) আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা[১৪] পেতে চাই না। আমরা তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘ দিন।

এবং কারো সাথে কথা না বলার মানত করেছিল তার কাহিনী উল্লেখ করার পর ইমাম মালেক (র) তাঁর গ্রন্থ মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, নবী (সা) তাকে মানত ভঙ্গ করার নির্দেশদানের সাথে সাথে কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে কোন সূত্র থেকেই আমি জানতে পারিনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا -

"কেউ কোন বিষয়ে মানত করার পর যদি দেখে যে, অন্য একটি জিনিস তার চেয়ে উত্তম তাহলে সে যেন তা পরিত্যাগ করে এবং যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে। আর ঐটি ছেড়ে দেয়াই হবে তার কাফ্‌ফারা।" (আবু দাউদ)

বায়হাকীর মতে এ হাদীসটি এবং হযরত আবু হুরাইরার রেওয়ায়াতের 'যে কাজটি উত্তম সেটি করবে আর এরূপ করাই এর কাফ্‌ফারা' এ অংশটুকু প্রমাণিত নয়। এসব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র) শরহে মুসলিমে লিখছেন; "ইমাম মালেক (র) শাফেয়ী (র), আবু হানীফা (র), দাউদ যাহেরী এবং সংখ্যাগুরু আলেমদের মতে গোনাহর কাজের মানত বাতিল এবং তা পূরণ না করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আহমাদের (র) মতে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।"

১১. মূল শব্দ হলো على حبه । অধিকাংশ মুফাসসির حُبِّه এর ہ শব্দটিকে (طعام) খাদ্যের সর্বনাম হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। তাঁরা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেক্‌কার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হলো على حب الاطعام অর্থাৎ গরীব ও দুস্থদের খাওয়ানোর আকাংখা ও উৎসাহের

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١١﴾ وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেদিনের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।[১৫] আর তাদের সবরের বিনিময়ে[১৬] তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তারা সেখানে উঁচু আসনের ওপরে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদের উত্তাপ কিংবা শীতের তীব্রতা তাদের কষ্ট দেবে না। জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছায়া দিতে থাকবে। আর তার ফলরাজি সবসময় তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (তারা যেভাবে ইচ্ছা চয়ন করতে পারবে)। তাদের সামনে রৌপ্য পাত্র[১৭] ও স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। কাঁচ পাত্রও হবে রৌপ্য জাতীয় ধাতুর[১৮] যা (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করে রাখবে।[১৯] সেখানে তাদের এমন সূরা পাত্র পান করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

কারণে তারা এ কাজ করে থাকে। হযরত ফুদাইল ইবনে আয়াদ্ব ও আবু সুলায়মান আদ–দারানী বলেন, তারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে এরূপ করে। আমাদের মতে পরবর্তী আয়াতাংশ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ (আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি) এ অর্থকেই সমর্থন করে।

১২. প্রাচীনকালে রীতি ছিল বন্দীদের হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়ে প্রতিদিন বাইরে বের করে আনা হতো। তারপর তারা রাস্তায় রাস্তায় ও মহল্লায় মহল্লায় ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। পরবর্তীকালে ইসলামী সরকার এ কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করে। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৫০, মুদ্রণ ১৩৮২ হিঃ) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া হোক বা ভিক্ষা করানো হোক, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে—যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না—খাবার দেয়া অতি বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

১৩. কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। যেমন কেউ কাপড়ের মুখাপেক্ষী, কেউ অসুস্থ তাই চিকিৎসার মুখাপেক্ষী অথবা কেউ ঋণগ্রস্ত, পাওনাদার তাকে অস্থির ও অতিষ্ঠ করে তুলছে। এসব লোককে সাহায্য করা খাবার খাওয়ানোর চেয়ে কম নেকীর কাজ নয়। তাই এ আয়াতটিতে নেকীর একটি বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রকে তার গুরুত্বের কারণে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় এর মূল উদ্দেশ্য অভাবীদের সাহায্য করা।

১৪. গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা এভাবে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিময় চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে।

১৫. অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেক্‌কার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ–কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে। একথাটিই সূরা আম্বিয়াতে এভাবে বলা হয়েছে; "চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহ্বল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।" (আয়াত, ১০৩) এ বিষয়টিই সূরা নাম্‌লে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে ঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।" (আয়াত, ৮৯)

১৬. এখানে 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ঈমানদারদের গোটা পার্থিব জীবনকেই 'সবর' বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার বা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাংখাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, নিজের অর্থ–সম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ–লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ–কষ্ট আসে তা সহ্য করা, হারাম পন্থায় লাভ করা যায় এরূপ প্রতিটি স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি, মর্মবেদনা ও দুঃখ–কষ্ট এসে ঘিরে ধরে তা বরদাশত করা—এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে, এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। এটা এমন একটা কর্মপন্থা যা মু'মিনের গোটা জীবনকেই সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে। এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬০; আলে ইমরান, টীকা ১৩, ১০৭, ১৩১; আল আন'আম, টীকা ২৩; আল আনফাল, টীকা ৩৭, ৪৭; ইউনুস, টীকা ৯; হূদ,

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا
رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا
كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ
فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ
سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

এটি জান্নাতের একটি ঝর্ণা যা সালসাবীল নামে অভিহিত।[২০] তাদের সেবার জন্য এমন সব কিশোর বালক সদা তৎপর থাকবে যারা চিরদিনই কিশোর থাকবে। তুমি তাদের দেখলে মনে করবে যেন ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।[২১] তুমি সেখানে যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই শুধু নিয়ামত আর ভোগের উপকরণের সমাহার দেখতে পাবে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।[২২] তাদের পরিধানে থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক এবং মখমল ও সোনালী কিংখাবের বস্ত্ররাজি।[২৩] আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে।[২৪] আর তাদের রব তাদেরকে অতি পবিত্র শরাব পান করাবেন।[২৫] এ হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতিদান। কারণ, তোমাদের কাজ কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে।[২৬]

টীকা ১১; আর রা'দ, টীকা ৩৯; আন নাহ্‌ল, টীকা ৯৮; মারয়াম, টীকা ৪০; আল ফুরকান, টীকা ৯৪; আল কাসাস, টীকা ৭৫, ১০০; আল আনকাবূত, টীকা ৯৭; লোকমান, টীকা ২৯, ৫৬; আস সাজদা, টীকা ৩৭; আল আহযাব, টীকা ৫৮; আয্ যুমার, টীকা ৩২; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ৩৮; আশ শুরা, টীকা ৫৩।)

১৭. সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের সামনে সবসময় স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল যে, সেখানে কোন সময় স্বর্ণপাত্র এবং কোন সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে।

১৮. অর্থাৎ তা হবে রৌপ্যের তৈরী কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ। এ ধরনের রৌপ্য এ পৃথিবীতে নেই। এটা জান্নাতের একটা বৈশিষ্ট যে, সেখানে কাঁচের মত স্বচ্ছ রৌপ্যপাত্র জান্নাতবাসীদের দস্তরখানে পরিবেশন করা হবে।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র ভরে ভরে দেয়া হবে। তা তাদের চাহিদার চেয়ে কমও হবে না আবার বেশীও হবে না। অন্য কথায়, জান্নাতের খাদেমরা এত সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে।

(জান্নাতের শরাবের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস্ সাফফাত, ৪৫ থেকে ৪৭ আয়াত, টীকা ২৪ থেকে ২৭; সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৫, টীকা ২২; আত্ তূর, আয়াত ২৩, টীকা ১৮; আল ওয়াকিয়া, আয়াত ১৯, টীকা ১০।)

২০. আরবরা শরাবের সাথে শুকনো আদা মেশানো পানির সংমিশ্রণ খুব পছন্দ করতো। তাই বলা হয়েছে, সেখানেও তাদের এমন শরাব পরিবেশন করা হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে। কিন্তু তা এমন সংমিশ্রণ হবে না যে, তার মধ্যে শুকনো আদা মিশিয়ে তারপর পানি দেয়া হবে। বরং তা হবে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার মধ্যে আদার খোশবু থাকবে কিন্তু তিক্ততা থাকবে না। সে জন্য তার নাম হবে 'সালসাবীল'। 'সালবাসীল' অর্থ এমন পানি যা মিঠা, মৃদু ও সুস্বাদু হওয়ার কারণে সহজেই গলার নীচে নেমে যায়। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 'সালসাবীল' শব্দটি এখানে উক্ত ঝর্ণাধারার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ্য হিসেবে নয়।

২১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফ্ফাত, টীকা ২৬; আত তূর, টীকা ১৯; আল ওয়াকিয়া, টীকা ৯।

২২. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যত দরিদ্র ও নিসম্বলই হোক না কেন সে যখন তার নেক্ কাজের কারণে জান্নাতে যাবে তখন সেখানে এমন শানশওকত ও মর্যাদার সাথে থাকবে যেন সে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি।

২৩. এই একই বিষয় সূরা আল কাহ্ফের ৩১ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ –

"তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা) মিহি রেশম এবং মখমল ও কিংখাবের সবুজ পোশাক পরিধান করবে। সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে।"

এ কারণে সেসব মুফাস্সিরদের মতামত সঠিক বলে মনে হয় না যারা বলেন, এর অর্থ এমন কাপড় যা তাদের আসন ও পালংকের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে অথবা সেসব কিশোর বালকদের পোশাক–পরিচ্ছদ যারা তাদের সেবা ও খেদমতের জন্য সদা তৎপর থাকবে।

২৪. সূরা আল কাহফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ "তাদের সেখানে স্বর্ণের কংকন বা চুড়ি দ্বারা সজ্জিত ও শোভিত করা হবে।" এ একই বিষয় সূরা হজ্জের ২৩ আয়াত এবং সূরা ফাতেরের ৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে। এসব আয়াত একত্রে মিলিয়ে দেখলে তিনটি অবস্থা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। এক, তারা ইচ্ছা করলে কোন সময় সোনার কংকন পরবে আবার ইচ্ছা করলে কোন সময় রূপার কংকন পরবে। তাদের ইচ্ছা অনুসারে দু'টি জিনিসই প্রস্তুত থাকবে। দুই, তারা সোনা ও রূপার কংকন এক সাথে পরবে। কারণ দু'টি একত্র করলে সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায়। তিন, যার ইচ্ছা সোনার কংকন পরিধান করবে এবং যার ইচ্ছা রূপার কংকন ব্যবহার করবে। এখানে প্রশ্ন হলো, অলংকার পরিধান করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষদের অলংকার পরানোর অর্থ ও তাৎপর্য কি হতে পারে? এর জবাব হলো, প্রাচীনকালে রাজা–বাদশাহ এবং নেতা

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ
مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا
بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ
رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

২ রুকূ'

হে নবী, আমিই তোমার ওপরে এ কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি।[২৭] তাই তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার রবের হুকুম পালন করতে থাকো[২৮] এবং এদের মধ্যকার কোন দুষ্কর্মশীল এবং সত্য অমান্যকারীর কথা শুনবে না।[২৯] সকাল সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ করো। রাতের বেলায়ও তার সামনে সিজ্‌দায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।[৩০] এসব লোক তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকে (দুনিয়াকে) ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে।[৩১] আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সন্ধিস্থল মজবুত করেছি। আর যখনই চাইবো তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দেব।[৩২] এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান।[৩৩] আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। আর জালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।[৩৪]

ও সমাজপতিদের রীতি ছিল তারা হাত, গলা ও মাথার মুকুটে নানা রকমের অলংকার ব্যবহার করতো। আমাদের এ যুগেও বৃটিশ ভারতের রাজা ও নবাবদের মধ্যে পর্যন্ত এ

রীতি প্রচলিত ছিল। সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ) যখন সাদাসিধে পোশাকে শুধু একখানা লাঠি হাতে নিয়ে ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন যে, তিনি বিশ্ব–জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল তখন ফেরাউন তার সভাসদদের বললো ঃ সে এ অবস্থায় আমার সামনে এসেছে। দূত বটে।

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ

"সে যদি যমীন ও আসমানের বাদশাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকতো তাহলে তার সোনার কংকন নাই কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী অন্তত তার আরদালী হয়ে আসতো।" (আয যুখরুফ, ৫৩ আয়াত)

২৫. ইতিপূর্বে দু' প্রকার শরাবের কথা বলা হয়েছে। এর এক প্রকার শরাবের মধ্যে কর্পূরের সুগন্ধি যুক্ত ঝর্ণার পানির সংমিশ্রণ থাকবে। অন্য প্রকারের শরাবের মধ্যে 'যানজাবীল' ঝর্ণার পানির সংমিশ্রণ থাকবে। এ দু' প্রকার শরাবের কথা বলার পর এখানে আবার আর একটি শরাবের উল্লেখ করা এবং সাথে সাথে একথা বলা যে, তাদের রব তাদেরকে অত্যন্ত পবিত্র শরাব পান করাবেন এর অর্থ এই যে, এটা অন্য কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর শরাব হবে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তাদের পান করানো হবে।

২৬. মূল বাক্য হলো, كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ তোমাদের কাজ-কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে। سعى অর্থ বান্দা সারা জীবন দুনিয়াতে যেসব কাজ–কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে বা দেয় তা সবই। যেসব কাজে সে তার শ্রম দিয়েছে এবং যেসব লক্ষে সে চেষ্টা–সাধনা করেছে তার সমষ্টি হলো তার سعى আর তা মূল্যবান প্রমাণিত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে তা মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে। শোকরিয়া কথাটি যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য হয় তখন অর্থ হয় তাঁর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হয় তখন তার অর্থ হয় আল্লাহ তা'আলা তার কাজ–কর্মের মূল্য দিয়েছেন। এটি মনিব বা প্রভুর একটি বড় মেহেরবানী যে, বান্দা যখন তাঁর মর্জি অনুসারে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দেয় মনিব তখন তার মূল্য দেন বা স্বীকৃতি দেন।

২৭. এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও বক্তব্যের মূল লক্ষ কাফেররা। মক্কার কাফেররা বলতো, এ কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চিন্তা–ভাবনা করে রচনা করছেন। অন্যথায়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ফরমান এলে তা একবারেই এসে যেতো। কুরআনে কোন কোন যায়গায় তাদের এ অভিযোগ উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৯।) এখানে তাদের অভিযোগ উদ্ধৃত না করেই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনের নাযিলকারী আমি নিজেই। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রচয়িতা নন। আমি নিজেই তা ক্রমান্বয়ে নাযিল করছি। অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবী হলো, আমার বাণীকে একই সাথে একটি গ্রন্থের আকারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা।

২৮. অর্থাৎ তোমার 'রব' তোমাকে যে বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার আদেশ দিয়েছেন তা আঞ্জাম দেয়ার পথে যে দুঃখ-যাতনা ও বিপদ-মুসিবত আসবে তার জন্য 'সবর' করো। যাই ঘটুক না কেন সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তা বরদাশত করতে থাকো এবং এ দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় যেন কোন বিচ্যুতি আসতে না পারে।

২৯. অর্থাৎ তাদের কারো চাপে পড়ে দীনে হকের প্রচার ও প্রসারের কাজ থেকে বিরত হয়ো না এবং কোন দুষ্কর্মশীলের কারণে দীনের নৈতিক শিক্ষায় কিংবা সত্য অস্বীকারকারীর কারণে দীনের আকীদা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতেও প্রস্তুত হয়ো না। যা হারাম ও নাজায়েয তাকে খোলাখুলি হারাম ও নাজায়েয বলো, এর সমালোচনার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হওয়ার জন্য কোন দুষ্কর্মশীল যতই চাপ দিক না কেন। যেসব আকীদা-বিশ্বাস বাতিল তাকে খোলাখুলি বাতিল বলে ঘোষণা করো। আর যা হক তাকে প্রকাশ্যে হক বলে ঘোষণা করো, এ ক্ষেত্রে কাফেররা তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য কিংবা এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা দেখানোর জন্য তোমার ওপর যত চাপই প্রয়োগ করুক না কেন।

৩০. কুরআনের প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো যেখানেই কাফেরদের মোকাবিলায় ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখানোর উপদেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এর পরপরই আল্লাহকে স্মরণ করার ও নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে। এ থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পায় যে, সত্য দীনের পথে সত্যের দুশমনদের বাধার মোকাবিলা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা এভাবেই অর্জিত হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করাও হতে পারে। তবে সময় নির্দিষ্ট করে যখন আল্লাহকে স্মরণ করার হুকুম দেয়া হয় তখন তার অর্থ হয় নামায। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا আরবী ভাষায় بكرة শব্দের অর্থ সকাল। আর اصيل শব্দটি সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে যোহর এবং আসরের সময়ও শামিল। এরপরে বলেছেন : وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ । রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের পরে। তাই রাতের বেলা সিজ্দা করার নির্দেশের মধ্যে মাগরিব এবং 'ঈশার দু' ওয়াক্তের নামাযই অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। এর পরের কথাটি "রাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা কর" তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি স্পষ্টভাবে ইংগিত করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, টীকা ৯২ থেকে ৯৭; আল মুয্যাম্মিল, টীকা ২।) এ থেকে একথাও জানা গেল যে, ইসলামে প্রথম থেকে এগুলোই ছিল নামাযের সময়। তবে সময় ও রাক'আত নির্দিষ্ট করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে মে'রাজের সময়।

৩১. অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের এসব কাফেররা যে কারণে আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহী এবং তাদের কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'দাওয়াতে হক' বা সত্যের আহবানের প্রতি অমনযোগী, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ হলো, তাদের দুনিয়া পূজা, আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্নতা, উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব। তাই একজন সত্যিকার আল্লাহভীরু মানুষের পথ এবং এদের পথ এতটা ভিন্ন যে, এ দু'টি পথের মধ্যে সমঝোতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৩২. মূল বাক্য হলো, اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً । এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি তাদের ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে পারি, যারা তাদের কাজ–কর্ম ও আচার –আচরণে এদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি এদের আকার–আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি। অর্থাৎ আমি যেমন কাউকে সুস্থ ও নিখুঁত অংগ–প্রত্যংগের অধিকারী করে সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি কাউকে পুরোপরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে এবং কাউকে আংশিক পক্ষাঘাতের দ্বারা মুখ বাঁকা করে দিতে আবার কাউকে কোন রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার বানিয়ে পংগু করে দিতেও সক্ষম। তৃতীয় অর্থ হলো, যখনই ইচ্ছা মৃত্যুর পর আমি এদেরকে পুনরায় অন্য কোন আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্‌সির, টীকা ৪১ (তাছাড়াও দেখুন, সূরা আদ দাহরের ১নং পরিশিষ্ট)।

৩৪. এ সূরার ভূমিকাতে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি। (তাছাড়াও সূরা আদ দাহরের ২ নং পরিশিষ্ট দেখুন।)

পরিশিষ্ট—১

৩৩নং টীকার সাথে সংশ্লিষ্ট

এ আয়াতগুলোতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। দুই, যদি আল্লাহ না চান তাহলে শুধু তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না। তিন, আল্লাহ অত্যন্ত কুশলী, সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী। এ তিনটি কথা সম্পর্কে যদি ভালভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে মানুষের বাছাই বা পছন্দ করার স্বাধীনতা এবং আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যকার সম্পর্ক খুব ভালভাবেই বুঝা যায় এবং তাকদীর সম্পর্কে মানুষের মনে যেসব জটিলতা দেখা যায় তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথম আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষকে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা শুধু এতটুকু যে, এখানে জীবন যাপনের জন্য যেসব ভিন্ন ভিন্ন পথ তার সামনে আসে সে তার মধ্য থেকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেবে। গ্রহণ বা বাছাই করার এরূপ অনেক স্বাধীনতা (Freedom of Choice) আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন। যেমন, এক ব্যক্তির সামনে যখন তার জীবিকা উপার্জনের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তার সামনে অনেকগুলো পথ থাকে। এসব পথের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকে হালাল পথ। যেমন, সবরকম বৈধ শ্রমকর্ম, চাকুরি–বাকুরি, ব্যবসায়–বাণিজ্য, অথবা শিল্প ও কারিগরী কিংবা কৃষি। আবার কিছু সংখ্যক থাকে হারাম পথ। যেমন, চুরি–ডাকাতি, রাহাজানি, পকেট মারা, ব্যভিচার, সুদখোরী, জুয়া, ঘুষ এবং হারাম প্রকৃতির সবরকম চাকুরি–বাকুরি ও ব্যবসায়–বাণিজ্য ইত্যাদি। এসব পথের মধ্য থেকে কোন্‌ পথটি সে বেছে নেবে এবং কিভাবে সে তার জীবিকা উপার্জন করতে চায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার মানুষকেই দেয়া হয়েছে। অনুরূপ নৈতিক চরিত্রেরও বিভিন্ন ঢং বা প্রকৃতি

আছে। এক দিকে আছে দীনদারী, আমানতদারী, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইনসাফ, দয়ামায়া, সমবেদনা এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার মত উন্নত স্বভাব ও গুণাবলী। অন্যদিকে আছে বদমাইশী, নীচতা, জুলুম–অত্যাচার, বেঈমানী, বখাটেপনা, বেহুদাপনা ও অভদ্রতার মত হীন স্বভাবসমূহ। এর মধ্য থেকে যে ঢং ও প্রকৃতির নৈতিক চরিত্রের পথ বা দোষ–গুণ সে অবলম্বন করতে চায় তা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার আছে। আদর্শ ও ধর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ ক্ষেত্রেও মানুষের সামনে বহু পথ খোলা আছে। নাস্তিকতা তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা, শিরক ও মূর্তিপূজা, শিরক ও তাওহীদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ এবং আল্লাহর আনুগত্যের একমাত্র নিখাদ ধর্ম কুরআন যার শিক্ষা দেয়। এর মধ্যেও মানুষ কোনটিকে গ্রহণ করতে চায় সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ারও মানুষের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জোর করে তার ওপরে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না যে, সে নিজে হালাল রুজি খেতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাকে হারামখোর হতে বাধ্য করছেন অথবা সে কুরআনের অনুসরণ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে জোরপূর্বক নাস্তিক, মুশরিক অথবা কাফের বানিয়ে দিচ্ছেন। অথবা সে চায় সৎ মানুষ হতে কিন্তু আল্লাহ খামকা তাকে অসৎ বানিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু পছন্দ ও নির্বাচনের এ স্বাধীনতার পরেও মানুষের যা ইচ্ছা তাই করতে পারা আল্লাহর ইচ্ছা, তার অনুমোদন ও তাওফীক দানের ওপর নির্ভর করে। মানুষ যে কাজ করার আকাংখা, ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে তা মানুষকে করতে দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে তবেই সে তা করতে পারে। অন্যথায় সে যত চেষ্টাই করুক না কেন আল্লাহর অনুমোদন ও তার ইচ্ছা ছাড়া সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয় আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, দুনিয়ার সব মানুষকে যদি সব ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দেয়া হতো আর এ বিষয়টিও তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে তাহলে সারা দুনিয়ার সব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম–শৃংখলা ধ্বংস এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অবাধ স্বাধীনতা পেলে একজন হত্যাকারীই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন পকেটমারের যদি এ ক্ষমতা থাকতো যে, যার পকেট ইচ্ছা সে মারতে পারবে তাহলের পৃথিবীর কোন মানুষের পকেটই তার হাত থেকে রক্ষা পেতো না। কোন চোরের হাত থেকে কারো সম্পদ রক্ষা পেতো না, কোন ব্যভিচারীর হাত থেকে কোন নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা পেতো না এবং কোন ডাকাতের হাত থেকে কারো বাড়ী–ঘর রক্ষা পেতো না, যদি এদের সবারই যথেচ্ছাচারের পূর্ণ ইখতিয়ার বা ক্ষমতা থাকতো। তাই মানুষ ন্যায় বা অন্যায় যে পথেই চলতে ইচ্ছা করুক না কেন সে পথে চলতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ বর্জন করে সত্যের পথ অবলম্বন করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাওফীক লাভ করেই কেবল সে সত্য পথে চলার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, গোমরাহীকে বর্জন করে হিদায়াতকে বাছাই ও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত খোদ মানুষকেই নিতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা জোরপূর্বক যেমন কাউকে চোর, খুনী, নাস্তিক বা মুশরিক বানান না তেমনি জোরপূর্বক তাকে ঈমানদারও বানান না।

অতপর তৃতীয় আয়াতে এ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছা আবার নিয়ম–বিধি মুক্ত স্বেচ্ছাচারমূলক (Arbitrary) ব্যাপার কিনা এ ভ্রান্ত ধারণা

দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা عليم এবং حكيم অর্থাৎ তিনি যেমন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী কুশলী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যা কিছু করেন জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সাথেই করেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাকে কি 'তাওফীক' দিতে হবে এবং কি দিতে হবে না, কাকে কি কাজ করতে দেয়া উচিত আর কাকে দেয়া উচিত নয় সে সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। মানুষকে তিনি যতটা অবকাশ দেন এবং উপায়-উপকরণকেও যতটা তার অনুকূল করে দেন ভাল হোক বা মন্দ হোক মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ঠিক ততটা কাজই করতে পারে। হিদায়াতলাভের ব্যাপারটাও এ নিয়মের বাইরে নয়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত আর কে নয় নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলাই তা জানেন এবং নিজের যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তিনিই করে থাকেন।

পরিশিষ্ট—২

৩৪নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতে জালেম বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর নবীর শিক্ষা আসার পর তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, তার আনুগত্য তারা করবে না। এর মধ্যে সেসব জালেমও আছে যারা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে আমরা এ বাণীকে আল্লাহর বাণী এবং এ নবীকে আল্লাহর নবী বলে মানি না। অথবা আল্লাহকেই আদৌ মানি না। আবার সেসব জালেমও আছে যারা আল্লাহ, নবী ও কুরআনকে মানতে অস্বীকার করে না বটে কিন্তু সিদ্ধান্ত তাদের এটাই থাকে যে, তাঁরা তার আনুগত্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি গোষ্ঠীই জালেম। প্রথম গোষ্ঠীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম জালেম নয়। বরং জালেম হওয়ার সাথে সাথে তারা মুনাফিক এবং প্রতারকও। তারা মুখে বলে, আমরা আল্লাহকে মানি, কুরআনকে মানি। কিন্তু তাদের মন ও মগজের ফায়সালা হলো, তার অনুসরণ তারা করবে না। আর তারা কাজও করে এর পরিপন্থী। এ দু' শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, আমি তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। দুনিয়াতে তারা যতই নির্ভীক ও বেপরোয়া চলুক, আরামআয়েশে বিভোর থাকুক এবং নিজের বাহাদুরীর ডংকা বাজাক না কেন অবশেষে তাদের পরিণাম কঠোর শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করা তাদের ভাগ্যলিপিতেই নেই।